# নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদ

আন্দ্রেয়াস স্কেডলার

[এই লেখা আন্দ্রেয়াস স্কেডলার রচিত 'দ্য লজিক অব ইলেক্টোরাল অথরিটারিয়ানিজম' শীর্ষক লেখা অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছে। মূল লেখাটি **আন্দ্রেয়াস স্কেডলার** সম্পাদিত **'ইলেক্টোরাল অথরিটারিয়ানিজম'** গ্রন্থভুক্ত। *সর্বজনকথার* জন্য সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন **কল্লোল মোস্তফা**]

নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদ বা ইলেক্টোরাল অথরিটারিয়ানিজমে জনপ্রতিনিধি ও সরকারপ্রধান নির্বাচিত করার জন্য নিয়মিতই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও ন্যায্যতার উদার-গণতান্ত্রিক নীতিমালাকে এমন ব্যাপক ও পদ্ধতিগত ভাবে লঙ্ঘন করা হয় যে নির্বাচন বিষয়টি 'গণতন্ত্রের হাতিয়ার'-এর বদলে কর্তৃত্ববাদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদী শাসনে নির্বাচন মোটাদাগে অংশগ্রহণমূলক হয় (সবর্জনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি থাকে), ন্যূনতম প্রতিযোগিতামূলক (বিরোধী দলগুলোকে জয় লাভ করতে দেয়া না হলেও নির্বাচনে অংশ নিতে দেয়া হয়) ও ন্যূনতম উন্মুক্ত (বিরোধী দলগুলোকে সর্বাত্মক দমন-পীড়ন চালানো হয় না, কিন্তু বাছাই করে করে মাঝে মাঝেই দমন-পীড়ন করা হয়) থাকে। তবে সব মিলিয়ে নির্বাচনি প্রতিযোগিতায় এত মারাত্মক, ব্যাপক ও পদ্ধতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তার করা হয় যে তখন আর তাকে গণতান্ত্রিক বলা চলে না। কর্তৃত্ববাদী প্রভাব বিস্তার নানাভাবেই করা হয়, কিন্তু সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য থাকে নির্বাচনি ফলাফলের অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করা : বৈষম্যমূলক নির্বাচনি আইন, বিরোধী দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনের মাঠ থেকে দূরে রাখা, তাদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বঞ্চিত করা, তাদের গণমাধ্যমে অংশগ্রহণ ও অর্থ সংগ্রহে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, সমর্থকদের ভোটাধিকারে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নানা উপায়ে বাধা প্রদান, ভয়ভীতি কিংবা প্রলোভনের মাধ্যমে পক্ষ ত্যাগ করানো কিংবা স্রেফ ভোট জালিয়াতি করা।

অনেক নির্বাচনি সরকারই গণতান্ত্রিক কিংবা গণতন্ত্রমুখী–কোনটাই নয়, বরং স্রেফ কর্তৃত্ববাদী। কিন্তু নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদ আমাদের চেনাজানা কর্তৃত্ববাদ থেকে একটু ভিন্ন। এইসব সরকারের কর্তৃত্ববাদী বৈশিষ্ট্য ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধরনের ভিত্তিতেই নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত। নির্বাচনি গণতন্ত্র থেকে ভিন্ন ধরনের বলেই এটা 'কর্তৃত্ববাদী' এবং 'বদ্ধ' স্বৈরতন্ত্র থেকে ভিন্ন বলে এটি 'নির্বাচনি'। ইলেক্টোরাল ডেমোক্রেসি বা নির্বাচনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লিবারেল ডেমোক্রেসি বা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় কিছু ঘাটতি থাকে (যেমন–জবাবদিহি, প্রাশাসনিক সততা, পক্ষপাতহীন বিচার বিভাগ ইত্যাদি), কিন্তু সেখানে বাধামুক্ত ও পক্ষপাতহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় হয় না। ক্লোজড ডেমোক্রেসি বা বদ্ধ স্বৈরতন্ত্র বলতে বাদবাকি সব ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে রাষ্ট্রের নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতায় আরোহণের জন্য বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না।

কর্তৃত্ববাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলোতে ক্ষমতা প্রয়োগের ধরনের ওপর জোর দেয়া হলেও নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদের ধারণাটিতে ক্ষমতায় আরোহণের (নির্বাচনের মাধ্যমে) প্রক্রিয়াটির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের অগণতান্ত্রিক চর্চার বদলে ক্ষমতায় আরোহণের অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কারণে কর্তৃত্ববাদী শাসনের (কে কিভাবে শাসন করছে) প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় না, বরং একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত হয়ে যায়। ক্ষমতায় আরোহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একদিকে, দীর্ঘ মেয়াদে, গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আরোহণ আর কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা চর্চা একসাথে যায় না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন, কর্তৃত্ববাদী শাসন তা নষ্ট করে ফেলে। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদী নির্বাচন শাসকদেরকে ততটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, যতটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। জনগণের পছন্দ-অপছন্দের বদলে যদি নির্বাচনি কারচুপির মাধ্যমে ভোটের ফলাফল নির্ধারিত হয়, তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না।

> এই ধরনের ম্যানিপুলেশন বা প্রভাব বিস্তারের কাজ করা হয় প্রকাশ্য দিবালোকে, রাষ্ট্রীয় এজেন্ট বা প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং জনস্বার্থ বা আইনের দোহাই দিয়ে। অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তির সমন্বয়ে ভোটারদেরকে ভয়ভীতি দেখানো, ভোট ক্রয় কিংবা ভোটের দিন ভোট জালিয়াতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনি নিয়ন্ত্রণ কৌশল গোপনে প্রয়োগ করারও চেষ্টা করা হয়।

### নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

আমরা কেমন করে নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদ শনাক্ত করব? নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ যতটা সহজ, বিভিন্ন দেশের মধ্যকার তুলনা করার জন্য তা পরিমাপ করা ততটা সহজ নয়। এসব দেশে যেহেতু মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে বাস্তবে স্বৈরতন্ত্রের চর্চা করা হয়, ফলে দেশের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'প্রকৃত' চরিত্র সম্পর্কে তীব্র বিতর্ক তৈরি করা হয়। ক্ষমতাসীনরা সেই সরকারকে গণতান্ত্রিক এবং বিরোধীরা কর্তৃত্ববাদী বলে অভিহিত করে। কোন সরকার যত বেশি দমন-পীড়নকারী ও প্রতারক হয়, তত বেশি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের পক্ষে ওই সরকারের কর্তৃত্ববাদী চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সহজ হয়। কিন্তু অনেক জটিল পরিস্থিতিতে নির্বাচনি গণতন্ত্র ও নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টানা এত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেন না।

অন্য যে কোন ধরনের নির্বাচনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনি ব্যবস্থার পার্থক্যটি ঠিক নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের মধ্যে নয়, বরং কর্তৃত্ববাদী আচরণের মধ্যে নিহিত। আনুষ্ঠানিক নির্বাচনি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয়, বরং পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আইনি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেই পার্থক্যটি থাকে। জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলেও যেহেতু তা পদ্ধতিগতভাবে কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তাই তার কোন গণতান্ত্রিক সারবত্তা থাকে না। আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনগুলো সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু নির্বাচনি জালিয়াতি বা প্রতারণাগুলো সব সময়

জনগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উন্মোচিত থাকে না। আমরা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল জানতে পারি, জানতে পারি কোন প্রার্থী কত ভোট আর কোন দল কত আসন পেল ইত্যাদি। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভোটের ফলাফলকে 'জনগণের আকাঙ্ক্ষার' নির্ভরযোগ্য প্রতিফলন বলে ধরে নেয়া যায় না।

নির্বাচনি কারচুপির একটা বড় অংশই করা হয় গোপনে। কিছু জিনিস আমাদের চোখের সামনেই ঘটে, যেমন–বৈষম্যমূলক নির্বাচনি আইন, প্রতিবাদী মিছিলে দমন-পীড়ন কিংবা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলে প্রার্থিতা বাতিল ইত্যাদি। এই ধরনের ম্যানিপুলেশন বা প্রভাব বিস্তারের কাজ করা হয় প্রকাশ্য দিবালোকে, রাষ্ট্রীয় এজেন্ট বা প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং জনস্বার্থ বা আইনের দোহাই দিয়ে। অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তির সমন্বয়ে ভোটারদেরকে ভয়ভীতি দেখানো, ভোট ক্রয় কিংবা ভোটের দিন ভোট জালিয়াতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনি নিয়ন্ত্রণ কৌশল গোপনে প্রয়োগ করারও চেষ্টা করা হয়। আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক যতভাবেই আমরা জানা বোঝার চেষ্টা করি না কেন, তথ্য-পরিসংখ্যান সংগ্রহের চেষ্টা করি না কেন, কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনি জালিয়াতির গোপন জগৎটি পুরোপুরি উন্মোচন করা কখনই সম্ভব হয় না। পেরুর ফুজিমোরি-মনতেসিনো সরকারের মত প্যান-অপটিক আকাঙ্ক্ষা খুব কম রেজিমেরই আছে, যার সব চাঁদাবাজি, নজরদারি ও ভিডিও টেপরেকর্ডিং থেকে অন্তত সরকার পতনের পরে হলেও মানুষ সত্যটা জানতে পেরেছে। কিন্তু সাধারণত অগণতান্ত্রিক খেলোয়াড়রা অদৃশ্য নির্বাচনি মঞ্চের পেছনে ঠিক কী ধান্দা করছে তার অনেক কিছুই জানা যায় না, এমনকি সবকিছু জানা গেলেও আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা সবকিছু জেনে গেছি। কর্তৃত্ববাদী শাসনে যে অবিশ্বাসের পরিবেশ বিরাজ করে তার ফলে আমাদের মধ্যে সব সময়ই একটা সন্দেহ কাজ করে যে নিশ্চয়ই সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটি আমাদের চোখের আড়াল করা হয়েছে। রাজনীতির মাঠে ক্রিয়াশীলরা জানেন যে টিকে থাকতে হলে ডায়েট্রোলজিয়া বা পর্দার আড়ালের রাজনীতি নামের প্রাচীন শিল্পটি চর্চা করতে হবে।

> কর্তৃত্ববাদী শাসকের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিরোধীপক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তারা কি এই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাঠে প্রবেশ করবে, নাকি নির্বাচন বয়কট করবে। আর ভোটগ্রহণ শেষে ও ফলাফল প্রকাশের পর বিরোধীদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তারা কি ফলাফল মেনে নেবে নাকি গণমাধ্যম, আদালত, রাজপথ কিংবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নালিশ নিয়ে যাবে।

জনপ্রিয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা মৌলিক অজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে অর্জিত আংশিক জ্ঞানের সমস্যায় পড়ি। আমরা 'স্থানীয় জ্ঞানের' মাধ্যমে কিংবা মতামত জরিপের মাধ্যমে জনগণের পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী পরিবেশে আমাদের পক্ষে কখনই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় নাগরিকরা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কতটুকু প্রকাশ করছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা না থাকার কারণে ব্যক্তির আচরণকে সব সময়ই কর্তৃত্ববাদী প্রভাবের শিকার হিসেবে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে। কর্তৃত্ববাদী শাসন জনগণের মতামত গঠন ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে।

## নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদের গতি-প্রকৃতি

নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোই স্থাপন করে, যার মধ্যে রয়েছে সংবিধান, নির্বাচন, সংসদ, আদালত, স্থানীয় সরকার এবং এমনকি জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এছাড়া এই ধরনের সরকার বেসরকারি গণমাধ্যম, বিভিন্ন স্বার্থরক্ষাকারী গ্রুপ ও নাগরিক সংগঠনেরও অনুমোদন দেয়। যদিও এসবের কোনটাই পাল্টা ক্ষমতা দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় না, তবু এসবের মধ্যে বিরোধ ও ভিন্নমতের সম্ভাবনা রয়ে যায়। এইসব প্রতিষ্ঠানকে একেবারে অগ্রাহ্য না করেও নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদের ধারণায় নির্বাচনের মাঠকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। ধরে নেয়া হয় লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচন বিষয়টিকে অগণতান্ত্রিক সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা অর্থবহ হয় তখনই যখন নির্বাচন বিষয়টি কর্তৃত্ববাদী সরকারের স্রেফ অলংকার হিসেবে না থাকে। নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদ নিয়ে কথা বলার অর্থই হল নির্বাচনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, এমনকি কর্তৃত্ববাদী কারচুপির পরিপ্রেক্ষিতেও নির্বাচন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নামের প্রতি সুবিচার করা হলে কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনি ব্যবস্থায় নির্বাচন বিষয়টি স্বীকৃতি আদায়ের আনুষ্ঠানিকতার চেয়েও বেশি কিছু। নির্বাচন রাজনৈতিক খেলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এমনকি নিপীড়ন, বৈষম্য কিংবা কারচুপিতে নিমজ্জিত থাকলেও খেলার মাঠ, নিয়ম-কানুন, খেলোয়াড়, সম্পদ ও কৌশল ইত্যাদির সমন্বয়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এমনকি নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতায় আরোহণের আনুষ্ঠানিক রাস্তা হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনকে প্রতিষ্ঠিত করলেও, প্রকৃতপক্ষে এটাই 'একমাত্র খেলা' নয়। ভোটের জন্য নির্বাচনি খেলার সাথে সাথে আরো দুটো বড় খেলার সূচনা হয় : একটা হল কর্তৃত্ববাদী প্রভাব বিস্তার, যার মাধ্যমে শাসকদল নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, আরেকটা হল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, যার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষগুলো ভোটের লড়াইয়ে বাধা প্রদানকারী অগণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণগুলো উচ্ছেদ করতে চায়। কর্তৃত্ববাদী নির্বাচন তাই কোন সাধারণ খেলা নয়, যেখানে খেলোয়াড়রা সর্বজনগ্রাহ্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের মধ্যে খেলেন; বরং এই নির্বাচন হল এমন এক প্রতিযোগিতাপূর্ণ, পরিবর্তনশীল, অভিযোজনমূলক খেলা, যেখানে খেলোয়াড়রা খেলতে খেলতেই খেলার নিয়ম পাল্টানোর চেষ্টা করেন। জর্জ সেবেলিজের ভাষায় তা 'নেস্টেড গেইমস' বা 'খেলার ভেতরের খেলা'র রূপ ধারণ করে, যেখানে নিয়ম অনুযায়ী খেলার সাথে সাথে খেলার নিয়মের ওপর খবরদারির জন্য কৌশলগত লড়াই চলে।

## বিরোধী দল

রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহণের পথ হিসেবে বহুদলীয় প্রতিযোগিতাকে স্বীকার করে নিয়ে নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদী সরকার রাজনৈতিক বিরোধিতার আইনি বৈধতা প্রদান করে। যদিও তারা বিরোধী শক্তিকে তাদের নিজেদের সুবিধামতো আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি বিরোধী দল গড়ে তোলা হয় এবং তাদের জন্য সুবিধাজনক আদর্শিক অবস্থানও বরাদ্দ করা হয়, যেমন–আনোয়ার সাদাতের আমলের মিসর এবং লিওপোল্ড সেনঘরের সেনেগাল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যাজনক বিরোধী দল ও প্রার্থীদেরকে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়।

যেহেতু নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদ এমন একটা ব্যবস্থা, যেখানে বিরোধী দলকে নির্বাচনে হারতে হয়, সে কারণে বিরোধী দলের জন্য নির্বাচন একটি ব্যাপক জটিল বিষয়। নির্বাচন যখন এই ব্যবস্থাটির বৈধতা প্রদান এবং ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিরোধী শক্তির মনোবল ও লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করতে থাকে। আবার নির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধীরা যত বেশি করে উলঙ্গ রাজার নগ্নতা উন্মোচন করতে সক্ষম হতে থাকে, জনগণের সম্মতি নয়, বরং কারচুপির মাধ্যমেই যে রাজা ক্ষমতায় আছে তা যত বেশি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বিরোধীপক্ষ ততই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনে পরাজিতদের পরাজয় মেনে নেয়ার কোন যৌক্তিক কারণ থাকে না, যেমনটা থাকে গণতান্ত্রিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে। এসব নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয় না, নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার মত যথেষ্ট অনিশ্চয়তা এতে থাকে না এবং পরাজিত পক্ষের সামনে এমন কোন সম্ভাবনা হাজির করতে পারে না, যেন তারা আগামী নির্বাচনে জয়লাভের আশাটুকু করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, কর্তৃত্ববাদী শাসকের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিরোধীপক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তারা কি এই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাঠে প্রবেশ করবে, নাকি নির্বাচন বয়কট করবে। আর ভোটগ্রহণ শেষে ও ফলাফল প্রকাশের পর বিরোধীদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তারা কি ফলাফল মেনে নেবে নাকি গণমাধ্যম, আদালত, রাজপথ কিংবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নালিশ নিয়ে যাবে।

শাসকদল নির্বাচনি কর্তৃত্ববাদে 'সুলতানি প্রবণতা' দেখা যেতে পারে, যেখানে পরিবারতান্ত্রিক শাসকরা নিয়মিত বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতার বৈধতা আদায় করে নেয়। কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনের সাংগঠনিক প্রয়োজনেই এই ব্যক্তিবাদেরও অবশ্য একটা সীমা থাকে। নিয়ন্ত্রিত বহুদলীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে শাসকরা শাসনকার্য চালাতে চান ভোটার জোগাড়ের জন্য তাঁদের একটা পার্টি (এবং সহযোগী রাষ্ট্র) প্রয়োজন হয় এবং নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা রাষ্ট্র (এবং সহযোগী পার্টি) প্রয়োজন হয়।

সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের জন্যই নির্বাচন বেশ জটিল এক হাতিয়ার। এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীন জোট সুবিধা বণ্টন, বিরোধ মীমাংসা ও ক্ষমতা সংহত করার সুযোগ পায়। আবার বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকিও থাকে। বিরোধী দলের মত সরকারি দলকেও নির্বাচনের মাঠে কৌশলগত আচরণের বিষয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় নির্বাচনে কারচুপি ও জনমত প্রভাবিত করার কাজের অনুপাত কেমন হবে। তারা কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণের ওপর কতটুকু নির্ভর করবে আর কারচুপির নানা উপায় থেকে কোন কৌশলগুলো বেছে নেবে। জনমত প্রভাবিত করার ওপর কতটুকু নির্ভর করবে আর ভোটার আকৃষ্ট করার কোন কৌশলগুলো বেছে নেবে? জনগণ, বিরোধীপক্ষ ও শাসকদল–এই তিন ধরনের খেলোয়াড় ও সংশিষ্ট নির্বাচনি কৌশলগুলোর সমন্বয়ে কর্তৃত্ববাদী নির্বাচন সব সময়ই বেশ সৃষ্টিশীল এক খেলা। এই তিন গ্রুপের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলাফল যতক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলও অনির্ধারিত থাকে। কর্তৃত্ববাদী নির্বাচনের নেস্টেড গেইম বা খেলার ভেতরের খেলার মধ্য দিয়ে ক্রমশ নির্বাচনের গণতন্ত্রায়ণ ঘটতে পারে, যেমন ঘটেছে সেনেগাল ও মেক্সিকোর ক্ষেত্রে। এর মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদের হঠাৎ পতনের ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যেমন ঘটেছে পেরু ও সার্বিয়ায় ২০০০ সালে। আবার সামরিক হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ববাদ আরও চেপে বসতে পারে, যেমন ঘটেছে ১৯৯৩ সালে আজারবাইজানে এবং ১৯৯৯ সালে আইভরি কোস্টে। আবার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হতে পারে, যেখানে ক্ষমতাসীন কর্তৃত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী বিরোধীপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও পুরোপুরি দমন করতে পারে না; ফলে অসম যুদ্ধ শেষও হয় না।
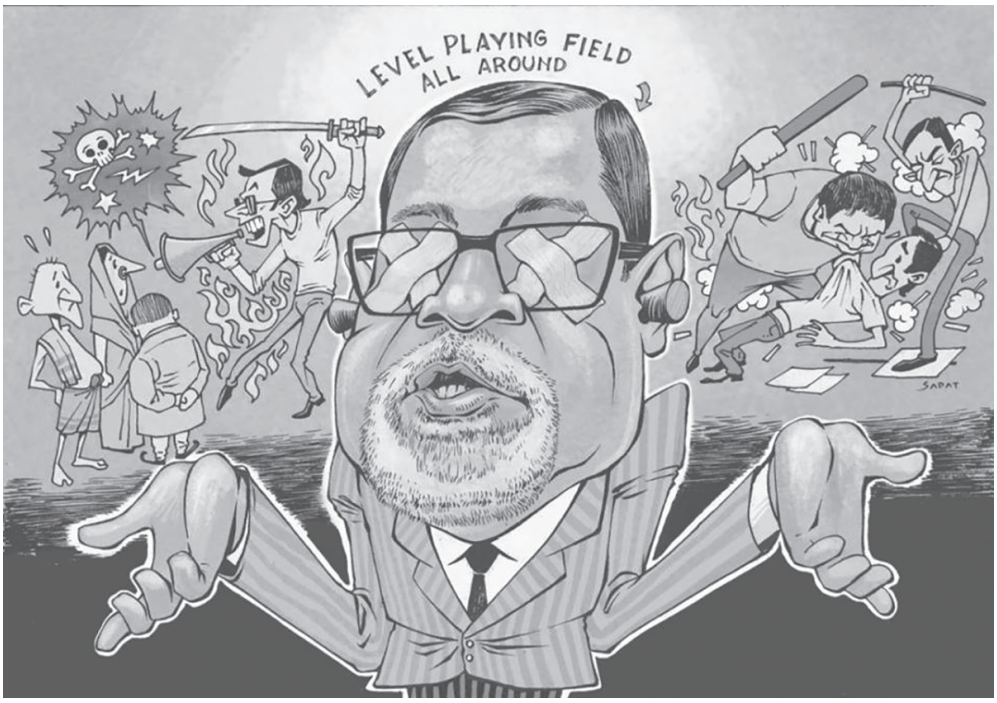
মূল লেখাটি পাওয়া যাবে এখানে :
https://www.ethiomedia.com/accent/ea_schedler.pdf